দৈনিক সংবাদ
তারিখ 26 APR 1993 পৃষ্ঠা 8 কলাম

# শিক্ষা ভাবনা ঃ অদ্ভুত উটের পিঠে

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

**সাতচল্লিশের স্বাধীনতার পর শিক্ষাবিষয়ক কমিটি ও কমিশন গঠনের ও রিপোর্ট তৈরির আনুষ্ঠানিকতা বজায় রয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার দারুণ ঘাটতি দেখা গেছে। সাতচল্লিশ থেকে বিরানব্বই— এই দীর্ঘ সময়ে, একমাত্র '৭২–'৭৫–এর সরকারকে ব্যতিক্রম বিবেচনা করলে, কোন সরকারই শিক্ষার প্রসঙ্গটিকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেননি; দেখছেন দলগত বা আদর্শগত (!) সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে। কমিটি বা কমিশন গঠনেও দেখা গেছে সঙ্কীর্ণতা, আর বাস্তবায়নের বেলা ইচ্ছার দুর্বলতা।**

বয়স চল্লিশ পেরুতে না পেরুতেই যারা বলতে শুরু করেন, আমাদের সময়ে তো এমনটি ছিল না, আর সামাজিক পরিবর্তনের সকল খারাপ দিক–গুলোর দায়িত্ব চাপিয়ে দেন নতুন প্রজন্মের ঘাড়ে,– আমি সে দলের নই। আমার থেকে বিশ বছরের কনিষ্ঠ আমার সহযোগী শিক্ষককে যখন আক্ষেপ করতে দেখি অনেক কিছু নিয়ে, বিশেষতছাত্রদের আচরণনিয়ে, তখন আমার বলতে লোভ হয়, আমি এ প্রজন্মের তরুণদের যেমন দেখছি, তেমনি তোমার প্রজন্মের যারা তরুণ, তাদেরও দেখেছি। আমি বলতে পারি, গুণগত কোন পরিবর্তন হয়নি। সৌজন্যই বলো, আর শিষ্টাচারই বলো, অতীতে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। তাহলে কি পরিবর্তন ঘটছে না? আমি কেন অস্বীকার করতে যাবো যে পরিবর্তন শুধু যে ঘটছে, তা–ই নয়, বিশ্বাসকে হার মানায়, এমন পরিবর্তন ঘটছে। কেবল একটু চিন্তা করে দেখতে হবে পরিবর্তনের স্বরূপটা কি। যেসব পরিবর্তন নিয়ে আমরা অনবরতই কথা বলি সেগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে স্থূল পরিবর্তন। এগুলোই আমাদের নজর কাড়ে। এসব দৃষ্টি–চমৎকারী পরিবর্তনের আড়ালে বিরাজ করছে যে অপরিবর্তনের ধারা সেগুলো অতো সহজে ধরা দেয় না।

এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একদিকে যেমন আছে পরিবর্তনের, অন্যদিকে আছে অপরিবর্তনের ধারা। পরিবর্তন যা ঘটেছে তার সিংহভাগ ঘটেছে সামাজিক পরিবর্তনের হাত ধরে, কোন পূর্ব–পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নয়। চেয়েছি বলে নয়, ঠেকাতে পারিনি, তাই। যেমন উচ্চশিক্ষায় আয়োজনের অতিরিক্ত ভিড়। যেখানে ব্যবস্থা আছে দশজনের, সেখানে ভিড় করছে তিরিশ জন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য চাপ আছে। সুতরাং ভর্তির যোগ্যতা থাক বা না থাক, আমরা দশজনের জায়গায় তিরিশজন ভর্তি করছি। এই সংখ্যাবৃদ্ধিতে আমাদের অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের কোন কৃতিত্ব নেই। সামাজিক চাপেই এটা হচ্ছে, তবু কৃতিত্বটা আমরা জোর করেই দাবি করছি। প্রাথমিক শিক্ষায় আয়োজন যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন আছে আয়োজন বাড়াবার। না বাড়াতে পারার বিফলতা আমরা হালকা করে দেখছি। এক্ষেত্রে সামাজিক চাপ কার্যকর নয়, কারণ যে শিক্ষা সর্বজনীন হতে হবে বলে আমরা সবাই জানি ও মানি, সে শিক্ষা তো সমগ্র সমাজের। আর সমগ্র সমাজের যে সিংহভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে রয়েছে, সে অংশ থেকে কোন সামাজিক চাপ নেই, বালক–বালিকাদেরকে, সরকারের ঘোষিত নীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে, এমন এক জীবনে প্রবেশ করানোর, যে জীবনের সঙ্গে সমাজের এই অংশের কোন সংযোগ নেই।

উচ্চশিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশাকে যদি আয়োজনের মাত্রা দিয়ে মাপতে হয় তাহলে বলতে হবে, এক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হল অনির্ধারিত ও অপরিমিত সংখ্যার,— বিশেষত তথাকথিত লিবারাল এডুকেশনের এলাকায়। হিসেবের বাইরে যে ছাত্র–জনতার চাপ, তার উৎস হচ্ছে বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বঙ্গ প্রদেশে উনবিংশ শতক থেকে নিজেকে তিন পুরুষ মুক্ত রেখেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টাও দুর্বল হয়ে পড়ল। প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ার পর, পরবর্তী প্রজন্ম পরম্পরায়, উচ্চশিক্ষা মূল্যবোধ থেকে পরিবর্তিত হয়েছে চাহিদায়। এই চাহিদার মধ্যে নিহিত আছে মূল্যবোধের উপাদানটিও, কিন্তু দুটি মিলে একটা ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়েছে। যদি কোন উচ্চ শিক্ষাঙ্গনের প্রথম পুরুষের প্রতিনিধিকে প্রশ্ন করা হয়, কেন এসেছ এখানে, কি প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ, সে কোন জবাব দিতে পারবে না। সবাই এসেছে, সেও এসেছে, গড্ডলিকার অংশ হয়ে। এই গড্ডলিকা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এরও একটি ইতিহাস আছে।

শিক্ষার নিম্ন, মধ্য, উচ্চ—সকল স্তরেই এমন একটা পরিস্থিতি দেখতে পাই, যার মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফুটে ওঠে। উপরের স্তরে যে সংখ্যাধিক্য, আর নীচের স্তরে সংখ্যাল্পতা— দুটিই এই ব্যর্থতার খবর দেয়। আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সংখ্যাধিক্য আমাদের উচ্চশিক্ষার প্রত্যাশিত মানকে যেমন দুঃসাধ্য করে তুলেছে, অন্যদিকে ব্যাপক দারিদ্র্যের সমস্যাকে জিইয়ে রেখে দরিদ্র–সন্তানকে নিয়ে টানাটানি এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছে। সমাজের অশিক্ষিত অংশে যেমন জন্মশাসনের বাণী পৌঁছতে পারছে না, সমাজের দারিদ্র্যপীড়িত অংশেও তেমনি বাধ্যতা–মূলক প্রাথমিক শিক্ষার 'সরকারী হুকুম কার্যকর হচ্ছে না। যে ছেলে, যে মেয়ে খালি পায়ে, উদোম গায়ে ঘুরে বেড়ায়, পাতা কুড়োয়, শহরে ভদ্র–লোকদের বাজারের মোট বয়ে দু'চার টাকা আয় করে, পরিবারের টিকে থাকার লড়াইয়ে বাপ–মায়ের সঙ্গী হয়, তাকে স্কুলের পোশাক পরিয়ে, তার হাতে স্কুলের বই তুলে দিয়ে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার পালন করতে হলে যে সরকার প্রয়োজন, সে সরকার কোথায়?

সরকারের এই মৌলিক সীমাবদ্ধতা সরকার নিজেও জানে না। একটি জায়গায় কোন পরিবর্তন হয়নি। যে নিয়মে স্বৈরাচারী সরকার চলেছে, সেই একই নিয়মে চলছে আজকের নির্বাচিত, গণতান্ত্রিক সরকার। কারণ নীতিনির্ধারণ এখনও করছে সরকারী আমলারা। নীতিনির্ধারণের দৃঢ়তা বা

বদলাবার কথা। তারা তো তেমন বদলেছেন বলে মনে হয় না। আর আমলা মহল যে ছাঁচে তৈরি, তাতে তাদের বদলাবার কথা নয়।

জাতীয় শিক্ষা নিয়ে আমাদের বিদেশী প্রভুরা তেমন মাথা ঘামাননি। তবু ১৮৫৪–এর উড্ সাহেবের ডেসপ্যাচ, ১৮৮২–এর হান্টার সাহেবের রিপোর্ট, মধ্যবর্তী সময়ে পঞ্চবার্ষিক সমীক্ষা, ১৯০২–৪–এর লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার, ১৯১৭–১৯–এর স্যাডলার কমিশন, আর সর্বশেষ ১৯৪৪–এর সার্জেন্ট কমিটি, এ দেশের— এই উপমহাদেশের বলতে হয়— শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠনে ও সংস্কারে যে সেই পরাধীনতার শেষ শতকেও যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণের ধারাবাহিকতা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

সর্বজনীন শিক্ষার পথে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি; সে দায়িত্ব ঔপনিবেশিক সরকার গ্রহণ করেনি। কিন্তু শিক্ষা প্রসঙ্গে যখন যেটুকু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সর্ব ক্ষেত্রেই তার ভিত্তি ছিল বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে প্রচলিত পদ্ধতির মূল্যায়ন ও পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

সাতচল্লিশের স্বাধীনতার পর শিক্ষাবিষয়ক কমিটি ও কমিশন গঠনের ও রিপোর্ট তৈরির আনুষ্ঠানিকতা বজায় রয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার দারুণ ঘাটতি দেখা গেছে। সাতচল্লিশ থেকে বিরানব্বই– এই দীর্ঘ সময়ে, একমাত্র '৭২–'৭৫–এর সরকারকে ব্যতিক্রম বিবেচনা করলে, কোন সরকারই শিক্ষার প্রসঙ্গটিকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেননি; দেখছেন দলগত বা আদর্শগত (!) সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে। কমিটি বা কমিশন গঠনেও দেখা গেছে সঙ্কীর্ণতা, আর বাস্তবায়নের বেলা ইচ্ছার দুর্বলতা। এরই ফাঁকে ফাঁকে মন্ত্রণালয়ে, মূলতঃ আমলাদের চেষ্টায় ও সরকার অনুগৃহীত শিক্ষাবিদদের সহযোগিতায়, সরকারী রন্ধনশালা থেকে বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন স্বাদের, বিচিত্র গরম–মসলার সহযোগে তৈরি, এক একটি "শিক্ষানীতি"। একটি অগণতান্ত্রিক পরিবেশেই এ ধরনের অনাচার সম্ভব। এবং দুঃখের বিষয়, এই ধারা অব্যাহত আছে আজও।

ইংরেজী নিয়ে মরাকান্না শুরু হয়েছে বেশ জোরেশোরে, এই সরকারের আমলে। তবে শুরু

অযৌক্তিকতা প্রসঙ্গে আমি ইতিমধ্যেই আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। সরকার আমার পরামর্শকেই গ্রহণ করবেন, এটা আমি আশা করি না। তবে সরকার শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে, নীতিনির্ধারণে একটি শৃংখলা মেনে চলবেন, এটা আশা করতে পারি। আর শৃংখলা বলতে কি বোঝায়, তার ইংগিত আমি এই লেখাতেই দিয়েছি। শৃংখলা বলতে কি বোঝায় না— অর্থাৎ অবিশেষজ্ঞ মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী ও সর্ব ক্ষেত্রেই কর্তার ইচ্ছায় কর্ম নীতিতে বিশ্বাসী আমলা মহলের চিরাচরিত ভূমিকা পালন,— তাও স্পষ্ট ভাষায় বলতে চেয়েছি।

সাতচল্লিশ–উত্তর এই অগণতান্ত্রিক উত্তরাধিকার, কিন্তু দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই শুরু হয়নি। এর একটি প্রমাণ হাজির করে আজকের এই লেখাটি শেষ করব।

দেশ বিভাগের পর পূর্ব–বঙ্গের প্রাদেশিক সরকার শিক্ষা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মওলানা আকরাম খাঁ'র সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সুপারিশ Report of the East Bengal Educational System Reconstruction Committee নামে East Bengal Government Press প্রকাশ করে ১৯৫২ সালে।

প্রদেশের নাম East Bengal ও প্রকাশের সাল ১৯৫২– আশা করি সবাই খেয়াল করবেন।

ইংরেজী নিয়ে যখন সরকারী মহলে দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে এবং সরকার যখন প্রচার মাধ্যমেও তার উদ্বেগের কথা দেশবাসীকে জানিয়ে দিচ্ছেন, তখন দেখা যাক সেদিনের শিক্ষিত সমাজের শীর্ষ ব্যক্তিরা এ প্রশ্নে কি সুপারিশ করে–ছিলেন। সেদিন আমাদের মতো ইংরেজী–শিক্ষিত ইংরেজী–বিদ্বেষীদের মতামত প্রকাশের বয়স হয়নি। তবে কমিটির গঠনে লক্ষ্য করছি সেদিনের যারা প্রবীণ, অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ— তারাই ছিলেন। সুতরাং তাদের সুপারিশ তাদেরই ছিল; সম্ভবত আমলা মহল আজকের মতো অতোটা প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেনি, সামরিক শাসন যে সুযোগ সৃষ্টি করেছিল তাদের জন্য; আর আজকের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও বালিকাদের শিক্ষা। কমিটি প্রথম বৈঠকেই কয়েকটি "সাধারণ নীতি" গ্রহণ করে, সেগুলোর উল্লেখের প্রয়োজন নেই, কেবল একটির ক্ষেত্রে আছেঃ তৃতীয় সাধারণ নীতি। (iii) মাতৃ–ভাষা এই পর্যায়ে (প্রাথমিক শিক্ষায়) একমাত্র শিক্ষণীয় ভাষা হবে এবং মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। (আমি কমিটির ইংরেজী সুপারিশ বাংলা তর্জমায় পেশ করলাম)।

কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষায় দুটি ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলঃ মাতৃভাষা ও যে ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি তখনও অমীমাংসিত ছিল বলে স্পষ্টভাষায় এ বিষয়ে কমিটি কিছু বলেনি।

প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাই হবে একমাত্র শিক্ষণীয় ভাষা, আকরাম খান কমিটির এই স্পষ্ট সুপারিশ ১৯৭৪–এর কুদরাত–এ–খুদা কমিশনও করেছিল। এটা আমারও কথা। যদি এ পর্যায়ে ইংরেজীর মতো একটি একেবারেই ভিন্নধর্মী ভাষা অপটু শিক্ষকের হাতে শেখানোর দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহলে প্রাথমিক শিক্ষায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার আকর্ষণ ও আনন্দ এতটাই লোপ পাবে, যা আমরা কেবল কল্পনা করতে পারি। প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষা অনাবশ্যকই নয়, অনভিপ্রেত ও ক্ষতিকর। কথাটা যতো শীঘ্র আমরা মেনে নেব জাতির জন্য ততোটাই মঙ্গল।

প্রাক্–প্রাথমিক শিক্ষার উপর আকরাম খান কমিটি যেভাবে জোর দিয়েছে, তেমন জোর দিয়ে পরবর্তী সময়ের কোন কমিটি বা কমিশন বলেছে বলে মনে পড়ে না।

কমিটির সকল সুপারিশই যে আজকের দিনে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, তাও মনে করি না। যেমন, প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মশিক্ষা। এক্ষেত্রে কুদরাত–এ–খুদা কমিশনের চিন্তা অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত।

আকরাম খান কমিটি ধর্মশিক্ষার প্রশ্নে সকল সম্প্রদায়ের কথা মনে রেখেছিল এবং প্রদেশের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ছেলে–মেয়েদের জন্য কি ধরনের শিক্ষা দেয়া উচিত, এ বিষয়ে ঢাকার বিশপের পরামর্শ চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়। জবাবে ঢাকার বিশপ যে চিঠি দিয়েছিলেন রিপোর্টে তা সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিশপ বলেছিলেন, ধর্মশিক্ষা নিয়ে সরকারের ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই; রোমান ক্যাথলিক শিশুদের প্রয়োজনীয় ধর্মশিক্ষা আমরা চার্চের তরফ থেকেই দিয়ে থাকি।

এ চিঠির পর কমিটি শিক্ষাক্রম থেকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মশিক্ষার পাঠ্যসূচী বাদ দিয়ে দেয়।

মুসলমান শিশুদের জন্য ধর্মশিক্ষার যে পাঠ্যসূচী কমিটি তৈরি করে, সেখানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে পাঠ্যপুস্তক চালু করা হবে, বলা হয়, তবে মাতৃ–ভাষায়। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতেও "মাতৃভাষায়।"

অর্থাৎ ধর্মশিক্ষার জন্য এ পর্যায়ে আরবীভাষার প্রয়োজন নেই। আমরা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে